করোনায় শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্কট ও উত্তরণ

ড. কে এম জালাল উদ্দীন আকবর

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এক গুরুতর সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। দীর্ঘ্ বন্ধে ক্ষতির ব্যাপকতা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় এক বছর ব্যাপী দূর্যোগকেও ছাড়িয়ে গেছে । এই ক্ষতি বহুমাত্রিক। আমরা যে চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, কোভিড-১৯ এর কারণে আমাদের নূতন প্রজন্মের স্বপ্নসৌধ নির্মাণের মূলকেন্দ্র বিন্দু, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিপযর্স্থ হয়ে পড়েছে। বিগত সময়ে ১৬০টির ও বেশী দেশে স্কুল বন্ধ ছিল। বিশ্বব্যাপী ৩০০ মিলিয়নের মতো শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ১ কোটির মতো শিশু আর স্কুলে ফিরবে না। গত এপ্রিল মাসে ১৬০ কোটি তরুণ-তরুণী স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শতকরা হিসাবে যা প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ। সেভ দ্য চিলড্রেনের হিসাব মতে, দরিদ্র দেশগুলোর শিক্ষা খাত থেকে সাত হাজার সাত শত কোটি ডলার বরাদ্দ হ্রাস পাবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এত বড় আঘাত এই প্রথম। পুরো পৃথিবী জুড়ে এ রকম ভয়াবহ মহামারী আর কখনো ঘটে নি। ১৯০টিরও বেশী দেশের প্রায় ১.৬ বিলিয়ন শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।

করোনা প্রতিরোধে স্কুল বন্ধ-ঘোষণা একটি সহজ ও প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু এর মূল্য ও সুবিধা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট । সম্প্রতি নেদারল্যান্ডে পরিচালিত একটি জরিপ মোতবেক ,পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশটিতে, যেখানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বিশ্বে ঈর্ষণীয় এবং ব্রড-ব্যান্ড সুবিধা সর্বোচ্চ , সেখানে মাত্র ৮ সপ্তাহের স্বল্পমেয়াদী লকডাউনেও প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষাদান তেমন সুফল বয়ে আনে নি। বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত পরিবারে এ সত্য আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সেখানে ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ। পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের চিত্রটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। অনুরূপ জরিপ যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত হয়েছে, সেখানেও গষেকরা আশার বাণী শোনাতে পারেন নি।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে এক বছরের ও বেশী সময় সব ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা, দীর্ঘ্ সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকার কারণে অনেক শিশুর মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আসতে পারে। করোনা পরিস্থিতি একদিকে যেমন তাদের সঠিক মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি নিয়মতান্ত্রিক জীবনে অনভ্যস্ত হওয়ার প্রবণতা তৈরী হতে পারে। সারাক্ষণ বাসায় বন্দিজীবন কাটানোর জন্য তারা মোবাইল ও ইন্টার নেটের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তে পারে।

প্রযুক্তির ব্যবহার এখন একমাত্র হাতিয়ার :

এক সময় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সশরীরী উপস্থিতি ও চিন্তা চেতনা প্রকাশের কেন্দ্র ছিল শ্রেণিকক্ষ। কিন্তু মহামারীর ভয়াবহ সঙ্কটে চিরন্তন সে স্বরূপ ও চিন্তনের পুরোটা পরিবর্ত্ন ঘটেছে। তথ্য প্রযুক্তির কারণে পুরো বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক ক্ষতির মধ্যেও তথ্য প্রযুক্তির কারণে অভূতপূর্ব্ কিছু ধারণা উদ্ঘাটিত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা কাযর্কর করতে নূতন নূতন কৌশল তৈরী হচ্ছে। ইন্টার-নেট বা অন্তর্জাল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক অঞ্চলে শিক্ষা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। আমাদের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা এখন আমূল পরিবর্তনের মুখে। সময়ের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত এ সব শিক্ষাদান-প্রযুক্তি সানন্দে ব্যবহৃত হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে গিয়েছে।

অনেকের ধারণা, করোনা পরবর্তী সময়ে আমাদের পৃথিবী বা সমাজ আর আগের মতো হবে না। কাজেই এই বৈশিক সমস্যা মোকাবেলায় আমাদের প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতা অজর্ন করতে হবে। লগ ডাউনের ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা মাসের পর মাস বিদ্যায়তন ছেড়ে বাইরে থাকছে যা তাদের মানসিক বিকাশের জন্য অনুকূল নয়। এদের গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করে পাঠ্য বিষয়ের উপস্থাপনা তৈরী করে শিক্ষাদান করতে হবে। করোনা মহামারীতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিরাপদ নয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে হবে। এ দূঃসময়ে শিক্ষার ধারাবহিকতা নিশ্চিত করা জরুরী। উন্নত বিশ্বে দূর শিক্ষণ ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদেরও এ পথ অনুসরণ করা দরকার।

ইন্টার নেট বা অন্তর্জালের লভ্যতা :

বাংলাদেশের মতো দেশে অন্তর্জালের লভ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এখানে এক বিরাট সংখ্যক ছাত্রের কাছে অন্তর্জালের সুবিধা নেই। তাই অন-লাইন শিক্ষার সুবিধা তারা নিতে অক্ষম। যদিও ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর মুঠোফোন আছে, তবুও অনলাইন শিক্ষা নিশ্চিত করতে যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তা বৃহৎ সংখ্যক ছাত্রের কাছে নেই। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত করতে গেলে প্রয়োজন উচ্চ গতিসম্পন্ন্ ইন্টারনেট বা অন্তর্জালের সংযোগ। সারা দেশ জুড়ে এ ধরণের পরিষেবার উপস্থিতি অপ্রতুল।

বর্তমান পরিস্থিতি :

১। এ মুহূর্তে পাঠদানের ক্ষেত্রে যে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেগুলো হলো : জুম বা ওয়েব এক্স বা গুগল মিট বা মাইক্রোসফট টিম বা গো-টু-মিটিং ব্যবহার করে। শ্রেণিকক্ষে যেমন শিক্ষক এবং ছাত্ররা একে অন্যকে দেখতে পায়, ঠিক তেমনি এই ভিডিও-কনফারেন্সিং সফটওয়ারের শিক্ষক অন্তর্জালের সাহায্যে তারা পরস্পরকে দেখতে পায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ্ বিষয় হলো, এখন একটা লেকচারকে ক্যামেরার সাহায্যে রেকর্ড্ কার সম্ভব।

২। হাতে লেখার বদলে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন বা পিডিএফ বা ওয়েব লিংক বা ইউ টিউব লিংক ব্যবহার করা হচ্ছে। অন লাইন মাধ্যমগুলোর সব চাইতে বড় সুবিধা হচ্ছে সহজ সংরক্ষণ। তাই শিক্ষাদানের পরেও ছাত্ররা নিজেদের সময়ানুসারে অন-লাইন সংস্থানের সাহায্য নিতে পারছে।

৩। উপস্থিতি নথিভূক্ত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে গুগল স্প্রেড শীট এবং গুগল ক্লাশরুম। কিছু ক্ষেত্রে হোয়াটস্অ্যাপের মাধ্যমেও উপস্থিতির নথি রাখা হচ্ছে। এই নথি দরকার মতো প্রশাসনিক প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪। অনেক ক্ষেত্রে আগেই পাঠ পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং ক্লাসের সময় শুধুমাত্র সন্দেহ দূর করা হচ্ছে। এভাবে গতানুগতিক দক্ষ পাঠদান ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষাকে দক্ষতায় পরিবর্ত্ন করা এখন শিক্ষকের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

৫। আজকের যুগ মিশ্র শিক্ষার যুগ। তাই করোনা পরবর্তী জগতে ৪০ শতাংশ পাঠ অফলাইন বা গতানুগতিক পন্থায় এবং বাকি ৬০ শতাংশ অন্তর্জাল ভিত্তিক হবে। এতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির বিকাশ সম্ভব হবে। করোনা পরবর্তী পৃথিবী অনলাইন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে। তাই এই পরিবর্ত্ন দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে।

৬। দূরশিক্ষণ শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে চলেছে। ক্যাম্পাস-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমরা (virtual world) ক্যাম্পাস বিহীন শিক্ষাব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ছাত্ররা ঘরে বসেই পড়াশোনা করবে নানা অভিনব পন্থা ব্যবহার করে। তাই ভবিষ্যতে কাজ ও পড়াশোনা, দুটোই চালিয়ে যাবে। মুখস্থবিদ্যাকে প্রতিস্থাপন করে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চালু হবে।

৭। ভবিষ্যতে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিহজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ্ হয়ে উঠবে। এর ফলে অনেক কাজ এখন যা শিক্ষকেরা করেন তা স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠবে। এই মৌলিক সত্যকে মেনে নিয়ে তাঁরা নিজেদের যোগ্য করে তুলবেন।

৮। অনলাইন আলোচনাসভা বা ওয়েবিনার জ্ঞান অজর্ন বা জ্ঞান বিতরণের একটি প্রাথমিক পন্থা হয়ে উঠবে। বিশ্ব জুড়ে সব নামী বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক ওয়েবিনার সংগঠিত করেছে। করোন-পরবর্তী কারে এদের সংখ্যা আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়।

৯। কেউ যদি মনে করেন এ সব পরিবর্তন কেবলই সাময়িক, করোনা মুক্তির সঙ্গে আমরা আবার পুরোণো পদ্ধতিতে ফিরে যাব, তবে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। শিক্ষা চিরতরে পাল্টাচ্ছে এবং এই বদলের সঙ্গে তাঁরা যদি মানিয়ে নিতে না পারেন ,তাঁরা বিলুপ্ত প্রাণির মতো হয়ে যাবেন।

উল্টো চিত্র:

এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে অনেক শিক্ষার্থী অন-লআইন বা ই-লার্নিং ব্যবস্থায় অভ্যস্থ নয়। শুধু শিক্ষার্থী নয়, অনেক শিক্ষক পুরোণো পাঠদান প্রক্রিয়াকে বেশি পচ্ছন্দ করেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য অন-লাইন পাঠদান ব্যয়বহুল। এত শিক্ষার্থীদের স্মার্ট্ ফোন বা ল্যাপটপের মতো প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া ডাটা কিনতে হয়। স্মার্টফোন প্রযুক্তি অতীতের চেয়ে সর্ব্যাপী হতে পারে , তবে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য এটা

চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। করোনার কারণে বিপন্ন অর্থনীতি মোকাবলো করতে গিয়ে সব স্তরের অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। সিডিপি ও অক্সফ্যাম-এর এক জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে গত বছর এপ্রিল-মে মাসে ৬২ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন।

চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অনলাইন শিক্ষার সুবিধাও রয়েছে। প্রথমত, শিক্ষককে অনলাইন মানিয়ে নিতে তাঁর কোর্স আপডেট করতে হবে। অনলাইন শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতি থেকে পৃথক। শিক্ষককে অন-লাইন পাঠদানের জন্য গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড্ অনুযায়ী কোর্স্ ডিজাইন করতে হবে যা তাঁকে নতুনভাবে ক্লাশ নিতে প্রেরণা দেয়। দ্বিতীয়ত, অনলাইন শিক্ষা এমন একটি প্ল্যাট-ফরম, যেখানে শিক্ষকেরা ভিডিও লেকচার শীট তৈরী করেন, যাতে শিক্ষার্থীরা কোর্সের একাধিকবার দেখতে বা বিশ্লেষণ করার সুযোগ পায়। প্রযুক্তি চালিত বিশ্বে কিভাবে অন-লাইন এবং শ্রেণিকক্ষে উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে এই পদ্ধতিতে ধারণা লাভ করবে।

সঙ্কট থেকে উত্তরণ :

করোনার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ বিশ্বের ১.৬ বিলিয়ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের প্রায় অপূরণীয় ক্ষতির হিসাব করে দেখা গিয়েছে, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় করোনাকালে শিক্ষার্থীরা তাদের সাধারণ পাঠ্যক্রমের

কেবল ৭০% এবং গণিতে ৫০% জ্ঞান অজর্ন করতে পেরেছে। এটা আবার নির্ভ্র করছে প্রযুক্তির সহজ লভ্যতা এবং শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশের উপর। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে বৈষম্যের সূচনা হয়েছে। এই বৈষম্য প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যে যেমন হয়েছে, তেমনি হয়েছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যেও। তাই করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা-প্যাকেজের মধ্যে আনা অনিবার্য্ হয়ে দেখা দিয়েছে। তা না হলে বিগত বছরগুলোতে শিক্ষার যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে,তা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঝরে-পড়া বৃদ্ধি পাবে। কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে গড়ে তোলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঝিমিয়ে পড়বে। দেখা দিবে শিক্ষা-সঙ্কট।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে কিছুদিনের মধ্যেই করোনা-পূর্ব্ববর্তী রুটিনে ফেরা যাবে এ ধারণা অবাস্তব। হয়ত গতানুগতিক চিন্তার বাইরে আমাদের নূতনভাবে চিন্তা করতে হবে। সমস্যাটি জটিল ও বহুমুখী। তবে যে সমস্ত বিষয়ের উপর জরুরী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন সেগুলো হল:

ক) করোনাকালীন শিক্ষার ক্ষতি কতটুকু হয়েছে তা নিরুপন করা এবং তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া। কেউ কেউ মনে করেন ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষাবর্ষের পুনরাবৃত্তি করা একটা বিকল্প হতে পারে। কেনিয়া এবং আরো কয়েকটি দেশ এ ব্যবস্থা নিয়েছে। এর ফলে অবশ্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন দীর্ঘতর হবে যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এটি কোন এফেক্টিভ বিকল্প নয়।

খ) প্রণোদনার মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে ড্রপ-আউট বা ঝরে -পড়া বন্ধ করা। ক্লাসে অনুপস্থিতি হ্রাস করা। এ ক্ষেত্রে উপবৃত্তি প্রদানসহ অন্যান্য প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

গ) কারিকুলাম ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার করা। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের মাধ্যমে মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। পাঠ্যক্রম হ্রাস ও সংশ্লেষিত করা যেতে পারে। দেখতে হবে যাতে শিক্ষার গুণগত মান সঠিক থাকে। ভারতের উড়িষ্যা ও কানাডার অন্টারিও তে এটি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়গুলোতে বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

গ) শিক্ষাদানের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তিনির্ভ্র শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

ঘ) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন।

ঙ) শিক্ষকদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

চ) অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। সরকারি-বেসরকারি , ব্যক্তিগত সংস্থা ও সুশীল সমাজের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা।

ছ) বছরের দীর্ঘ্ ছুটিগুলো হ্রাস করে এবং মেক-আপ ক্লাসের ব্যবস্থা করা যায়। ফিলিপাইন্স গ্রীষ্মের ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জ) শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ কমিয়ে আনা। কোভিড পরবর্তী একটি ত্রিবার্ষিক বা চতুবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় অনধিক তিন্ চার মাস করে শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ কমিয়ে শিক্ষার ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা বিকল্প হতে পারে। ইথিওপিয়া ও নেপালে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

করোনা সঙ্কট এখনো শেষ হয়নি। বিশ্বে প্রায় ১০০ টি দেশ এখনো তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে পারে নি। তাই ব্যাপক বিপযর্য় থেকে রক্ষা পেতে জরুরীভিত্তেতে স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠান খুলে দিতে হবে। তবে সারা দেশে সব অঞ্চলের সব প্রতিষ্ঠান একযোগে খুলে দিতে হবে এমন নয়, পর্যায়ক্রমে এটি করা যেতে পারে। প্রথমে অপেক্ষাকৃত কম সংক্রামণ এলাকা বা সংক্রামণ নেই এমন ১০০টির মতো উপজেলায় বিদ্যালয় খোলা যেতে পারে। অন্তত দুই সপ্তাহ এগুলো পর্যবেক্ষণ করে পরিস্থিতি দেখে অন্য এলাকার জন্য ব্যবস্থা নেয় যেতে পারে। যেহেতু করোনা আমদের মধ্যে থেকে একবারে চলে যাচ্ছে না তাই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সপ্তাহে অন্তত্পক্ষে একদিন র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন্ অ্যান্টিবডি টেস্ট করিয়ে নিলে ভাল হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলেতে মানসম্মত আইসোলেশন ও কোয়ারাইন্টাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর এর জন্যে প্রয়োজন হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার।

নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে সবাইকে বুঝতে হবে শিক্ষা একটি দীর্ঘ্ মেয়াদী বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ থেকে যেমন রাতারাতি লাভবান হবার সুযোগ নেই, তেমনি করোনা বা করোনা-পরবর্তীকালীন যে কোন উদ্যোগের জন্যে ধৈর্য্ ও সুসমন্বিত পরিকল্পনার প্রয়োজন।